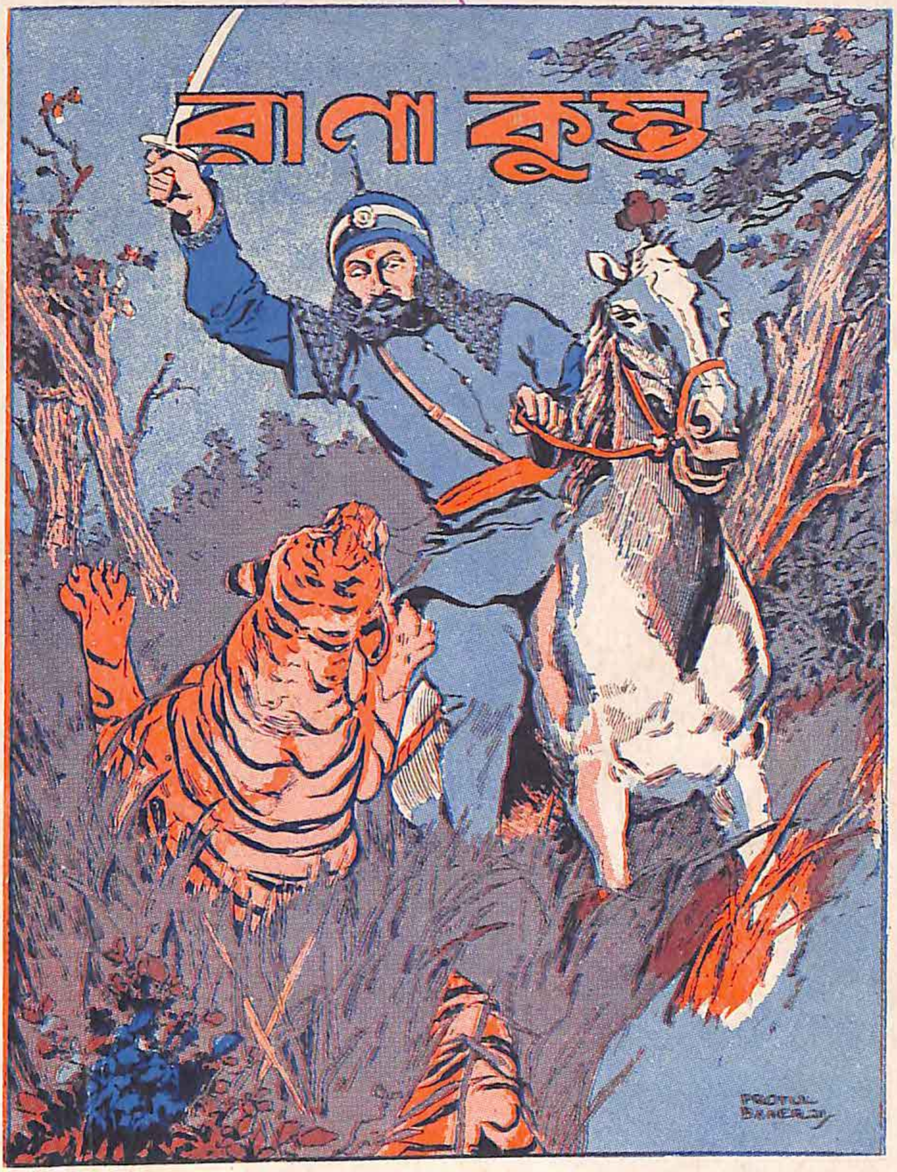

রাণা কুম্ভ
PROTUL BANERJY

রাজস্থান গ্রন্থমালা—অষ্টম-গ্রন্থ

রাণা কুম্ভ

'হেনরী ফোর্ড', 'কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথ', 'শিলাদিত্য', মহারাজ গুহ', 'বাপ্পাদিত্য', 'সমর সিংহ', 'যতীন্দ্রমোহন', 'রাণা সঙ্গ' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি.এস্-সি
প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

মে
১৯৮৫
৩

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ১·৫০

রাণা কুম্ভ

—:*:—

এক

মাদেরিয়ার পার্বত্য বনভূমিতে দিনের শেষে আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হইয়াছে, ঘন বনানীর দীর্ঘ ছায়াকে দীর্ঘতর করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে, এমন সময় চিতোরের রাণা মুকুল সেই অরণ্যের এক নির্জন অংশে নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া সান্ধ্য উপাসনা করিতেছিলেন। তাঁহার নয়ন নিমীলিত, চিন্তাহীন আননে ভগবৎনির্ভরতার সুমধুর প্রশান্তি।

অকস্মাৎ রাণার পশ্চাদ্দেশে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে দুইজন আততায়ীর আবির্ভাব হইল। তাহাদের নয়নে প্রতিহিংসার দীপ্তি, চরণে নিঃশব্দচারী তস্করের সতর্কতা। উপাসনারত রাণা তাহাদের উপস্থিতি অনুভব করিবার পূর্বেই উভয়ের সুতীক্ষ্ণ তরবারি তাঁহার শিরোদেশে আপতিত হইল। রাণা একবার মাত্র নয়ন মেলিয়া আততায়ীদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইবার পূর্বেই তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

এই দুই দুরাচার—চাচা ও মৈর, রাণা মুকুলেরই দুই পিতৃব্য। কেন তাহারা এই দুষ্কার্যে রত হইল, সে কথাই এখন বলিতেছি।

মাদেরিয়ার অসভ্য ভীলগণ কিছুদিন পূর্বে চিতোরের বিদ্রোহাচরণ করায় চিতোরেশ্বর মুকুল স্বয়ং তাহাদের দমন করিবার জন্য মাদেরিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সঙ্গে বহু সৈন্য-সামন্ত, আর তাঁহার দুই পিতৃব্য—চাচা এবং মৈর।

চাচা ও মৈর মুকুলের পিতামহ ক্ষেত্রসিংহের পুত্র হইলেও তাহাদের মা ছিলেন এক কাঠুরিয়ার কন্যা। তাই প্রধান প্রধান সামন্তেরা এই দুই ভাইকে কোন সময়েই তেমন সুনজরে দেখিতেন না। তদুপরি রাণা মুকুল যখন মাদেরিয়ার যুদ্ধে তাহাদিগকে সাতশত সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া দিলেন, তখন সামন্তের দল প্রকাশ্যে রাণার বিরুদ্ধাচরণ না করিলেও, চাচা ও মৈরকে জব্দ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

অচিরেই এক সুযোগ উপস্থিত হইল। ভীলদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাণা একদিন সৈন্য-সামন্ত-পরিবেষ্টিত হইয়া মাদেরিয়ার বনে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় কথা-প্রসঙ্গে তিনি নিকটস্থ একটি বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাণার পাশেই ছিলেন একজন চোহান সামন্ত। তিনি অন্যের অগোচরে অনুচ্চস্বরে রাণাকে বলিলেন, "মহারাণা, আপনার পিতৃব্যদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেই বৃক্ষটির সঠিক নাম জানিতে পারিবেন।"

সামন্তের কথার নিগূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া রাণা সরল মনে পিতৃব্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ গাছটির নাম কি বলুন না?"

চাচা ও মৈর রাণার এই সরল প্রশ্নের বিপরীত অর্থ করিল।

তাহারা ভাবিল, কাঠুরিয়া-কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই রাণা সকলের সমক্ষে তাহাদের এমন অপমান করিলেন! চাচা ও মৈরের পিতা এক কাঠুরিয়ার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

তখনকার মত এ-অপমান তাহারা নীরবে সহ্য করিল বটে, কিন্তু সত্বরই উহার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল। অবশেষে নিভৃত নিকুঞ্জে উপাসনারত রাণার রক্তে তাহারা তাহাদের প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিল।

তাহাদের প্রতিহিংসা নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু দুরাশা মিটিল না। দুরাশার বশবর্তী হইয়াই তাহারা রাণা-শূন্য চিতোর অধিকার করিবার জন্য দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহাদের সে দুরভিসন্ধি সফল হইল না। রাণা মুকুলের বালকপুত্র কুম্ভ কি মনে করিয়া পূর্বেই দুর্গের দ্বার অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাই তাহারা হতাশ হইয়া মাদেরিয়ার নিকটবর্তী এক দুর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু সে স্থানও নিরাপদ মনে না হওয়ায় তাহারা অবশেষে পায়ীগ্রামে আসিয়া দুর্গম রাতকোট পাহাড়ের উচ্চতম সানুদেশে দুর্ভেদ্য এক প্রাচীন দুর্গে বসবাস করিতে লাগিল।

রাণা মুকুল যেমন ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজ্যশাসন করিতেন, প্রজারাও তাঁহাকে তেমনিই ভালবাসিত। তাই তাহারা তাহাদের প্রিয় রাজার এই শোচনীয় মৃত্যুর উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

মুকুলজীর পুত্র কুম্ভ তখন বালক মাত্র। কিন্তু সিংহ-শাবক কোন দিনই মেষশিশু হয় না, শৈশবেও তাহার সিংহের বিক্রমই

থাকে। কুম্ভও পিতৃহন্তার সমুচিত শাস্তি-বিধানের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

এ দুষ্কার্য যে চাচা এবং মৈরের, এবং পাষণ্ডদ্বয় যে পায়ীগ্রামে রাতকোট দুর্গে অবস্থান করিতেছে, এ সংবাদ অবগত হইবামাত্র কুম্ভ অশ্বপৃষ্ঠে রাতকোট-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মারবার-অধিপতিও বালক রাণার সাহায্যার্থে তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন।

ইহা ছাড়া সুজা নামক চোহান বংশীয় এক রাজপুতের কুমারী কন্যাকে চাচা এবং মৈর অপহরণ করিয়া নেওয়ায় দুর্বৃত্ত-দের এ দুষ্কার্যের শাস্তি দিবার জন্য সুজাও কয়েকজন সঙ্গি-সমভিব্যাহারে রাতকোটের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল; পথে রাণা কুম্ভ ও মারবার-অধিপতির সহিত তাহার দেখা হইল। তিন-জনেরই উদ্দেশ্য এক, তিনজনে একই পথে চলিলেন।

সে কি বিষম পথ! যেমন দুর্গম, তেমনই বিপদ্-সংকুল! তবুও তিনজনে অসীম সাহসে ভর করিয়া অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন। বালক কুম্ভ সকলের অগ্রে—সঙ্গিগণ তাঁহার পশ্চাতে।

যাইতে যাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ঘন তমসায় পার্বত্য পথ একেবারে অন্ধকার হইয়া উঠিল, কিন্তু তবু তাঁহারা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন—এক তীব্র আলোকরেখা অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করিতেছে!

মারবার-পতি দেখিয়াই বুঝিলেন, এক ব্যাঘ্রী তাঁহাদের পথরোধ করিয়া বসিয়া আছে। মানুষের গন্ধ পাইয়া ব্যাঘ্রীর

রক্ত-পিপাসা জাগিয়া উঠিল বটে, কিন্তু সে পিপাসা নিবৃত্ত হইবার পূর্বেই রাজপুত বীরের অসির আঘাতে উহার ছিন্ন মুণ্ড ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

রাজপুতদের বিশ্বাস, পথিমধ্যে ব্যাঘ্র-শিকার অতি শুভ লক্ষণ। তাই তাঁহারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে দুর্গ-দ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের পদশব্দে চাচার পালিতা কন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। চাচা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "মা, কোন ভয় নাই। আমরা যে স্থানে আছি, কাহারও সাধ্য নাই, এখানে আসিয়া আমাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে।"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই কুম্ভ সদলবলে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্যাপার কি, অন্ধকারে তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্বেই মারবার-অধিপতির সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে চাচার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল, বালক কুম্ভ মৈরেরও প্রাণ-সংহার করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন।

দুই

এইভাবে পিতৃ-হন্তাদের শাস্তিবিধান করিয়া ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

রাজ্যে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাজকোষ অর্থ-পরিপূর্ণ, মেবারের শস্য-ক্ষেত্রে সোনা ফলিতেছে, প্রজাবৎসল রাণা প্রজাদিগকে পুত্রের মতো পালন করিতেছেন। এক কথায়

মেবারের সুখ-সৌভাগ্য তখন ভাদ্রের ভরা নদীর মতো কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

ইহা দেখিয়া আশে পাশের রাজ্যের রাজাদের অনেকেরই চক্ষুঃপীড়া উপস্থিত হইল। এই সকল পরশ্রীকাতরদের নিকট মেবারের এই সুখ-সৌভাগ্য একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল।

খলজী বংশীয় রাজাদের প্রভুত্ব খর্ব হইয়া আসিলে সেই সুযোগেই বিজয়পুর, গোলকুণ্ডা, মালব, গুর্জর, জৌনপুর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য দিল্লী-সম্রাটের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এ সকলের মধ্যে মালব ও গুর্জরই ছিল প্রধান। তাই চিতোরের এই সৌভাগ্য-গৌরবে তাহাদেরই ঈর্ষার অনল বেশী জ্বলিয়া উঠিল।

কিন্তু মালবই হৌক, আর গুর্জরই হৌক—রাণা কুম্ভের সহিত বীরত্বের পরীক্ষায় আঁটিয়া উঠা যে তাঁহাদের কাহারও একার কর্ম নয়, তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা একযোগে চিতোর আক্রমণ করিলেন।

মেবারের প্রান্তভাগে—মালব রাজ্যের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মালব ও গুর্জরের অগণিত সৈন্য-ব্যূহের সমাবেশ হইল। অশ্ব, গজ ও পদাতিকের পদভারে সেই বিশাল প্রান্তর থাকিয়া থাকিয়া, কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। অসির ঝংকারে, সৈন্য-সামন্তের কোলাহলে, আকাশ-বাতাস মুখর হইয়া উঠিল। শিবিরাভ্যন্তরে বসিয়া মালব ও গুর্জর-রাজ গুম্ফ আস্ফালন করিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, এক ফুৎকারেই চিতোর-রাণাকে উড়াইয়া দিয়া মেবার দখল করিয়া লইবেন।

এ দিকে চিতোরও নীরবে বসিয়া রহিল না। পররাজ্য-লোলুপ রাজাদের লোভের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য রাণা কুম্ভ এক লক্ষ সৈন্য ও চৌদ্দ শত হস্তী লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন।

শত্রু-পক্ষের তুলনায় কুম্ভের সৈন্য-সংখ্যা অনেক কমই ছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? তাহাদের বুকে ছিল অসীম বল, প্রাণে ছিল দুর্জয় সাহস। শত্রুর আক্রমণ হইতে জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার মরণ-পণ করিয়া যে সব দেশভক্ত বীর যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তাহাদের বীরত্বের পরিমাপ ত' শুধু সংখ্যায়ই হয় না!

তাই দুই দলে যুদ্ধ বাধিলে মুহূর্তেই তাহা তুমুল হইয়া উঠিল। বিপক্ষ সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য মেবার-বীরদের সহস্র সহস্র অসি এক সঙ্গে কোষমুক্ত হইয়া নাচিয়া উঠিল, আর নাচিল তাহাদের ধমনীর উষ্ণ রক্ত।

উদ্দাম জলস্রোতের মত রাজপুত সৈন্য মুসলমান সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল! সে কি ভীষণ বেগ! মুসলমান সৈন্য সে বেগ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। রাজপুতের বর্শা ও অসির মুখে তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। মালব ও গুর্জরের সম্মিলিত দল রাণার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল; মালবরাজ মহম্মদ খলজী কুম্ভ-কর্তৃক ধৃত ও বন্দী হইয়া চিতোরে আনীত হইলেন।

তিন

অন্ধকার কারাকক্ষে বসিয়া মালবরাজ বিমর্ষমনে আপনার ভাগ্য-বিবর্তনের কথাই ভাবিতেছিলেন ; আর প্রতীক্ষায় ছিলেন কখন বিজয়ী রাণার নিকট হইতে তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ আসিবে !

আদেশ আসিল! কিন্তু শিরশ্ছেদের নয়, রাজ-দরবারে উপস্থিতির। শৃঙ্খলাবদ্ধ মালবরাজ নতনয়নে রাজদরবারে প্রবেশ করিলেন।

রাণা কুম্ভ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মালবরাজ দরবারে প্রবেশ করিতেই তিনি আসন হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

মহম্মদ ভাবিলেন, বিজিত শত্রুর প্রতি বিজয়ী রাণার এ শুধু মার্জিত উপহাস! মার্জার যেমন করতলগত শিকার লইয়া ক্রীড়া করে, কুম্ভও তেমনই মহম্মদের সহিত রহস্য করিতেছেন!

কিন্তু পর-মুহূর্তেই মহম্মদের ভুল ভাঙ্গিল। রাণা স্বহস্তে তাঁহার শৃঙ্খল-বন্ধন খুলিয়া দিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "খলজীরাজ, আপনি মুক্ত! মেবারের কোন রাজপুতই আর আপনার শত্রুতাচরণ করিবে না! আমার সৈন্য-সামন্তেরা আপনাকে সসম্মানে আপনার রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।"

মহম্মদ যেন নিজের চক্ষুকর্ণকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না! বিশ্বাস না হইবারই কথা। কেননা শত্রুকে এভাবে

করতলগত পাইয়াও যে কেহ তাহার সহিত এমন বন্ধুর মত ব্যবহার করিতে পারে, মালবরাজের জীবনে এ যাবৎ তেমন কোন অভিজ্ঞতা হয় নাই।

তাই তাঁহার মনের সংশয় ঘুচিয়াও যেন ঘুচিতেছিল না। তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার এই মুক্তির মূল্য কি দিতে হইবে রাণা ?"

কুম্ভের প্রশান্ত আনন নির্মল হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন, "রাজপুত মুক্তি বিক্রয় করে না। রাজা! আপনাকে কোন মুক্তি-মূল্যই দিতে হইবে না।"

কিন্তু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "হ্যাঁ, মুক্তি-মূল্য কিছু চাই বই কি রাজা! যদি পারেন তবে ভাবিতে চেষ্টা করিবেন, রাজপুতও আপনাদের মতই মানুষ! স্বাধীনতাকে তাহারাও কম ভালবাসে না! তাহাদের এই স্বাধীনতার উপর আর এমন অযথা হস্তক্ষেপ করিবেন না।—এই আপনার মুক্তির পণ!"

মহম্মদ এতক্ষণ শুষ্ক নয়নে ছিলেন। রাণার এই মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রুর বন্যা বহিল।

মুগ্ধ মহম্মদ আপনার রাজমুকুট রাণার সিংহাসন-তলে রাখিয়া গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিলেন, "মহম্মদকে আজ যথার্থই জয় করিলেন রাণা! আপনার মহত্ত্বের দুর্গে সে চিরদিনের জন্য বন্দী হইয়া রহিল। আমার এই মহৎ পরাজয়ের চিহ্নস্বরূপ আমার রাজমুকুট আপনার রাজসভায় রাখিয়া গেলাম।"

মহম্মদ খিলজী আসিয়াছিলেন রাজ্য জয় করিতে, রাজপুতের হাত হইতে চিতোর কাড়িয়া লইতে, চিতোরের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন

করিতে! কিন্তু দেখিলেন, চিতোরের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন চিতোর-বীরদের হৃদয়ের মহত্ব! সে মহত্ব লুণ্ঠন করা যায় না, তাহাতে বাঁধা পড়িতে ইচ্ছা হয়!

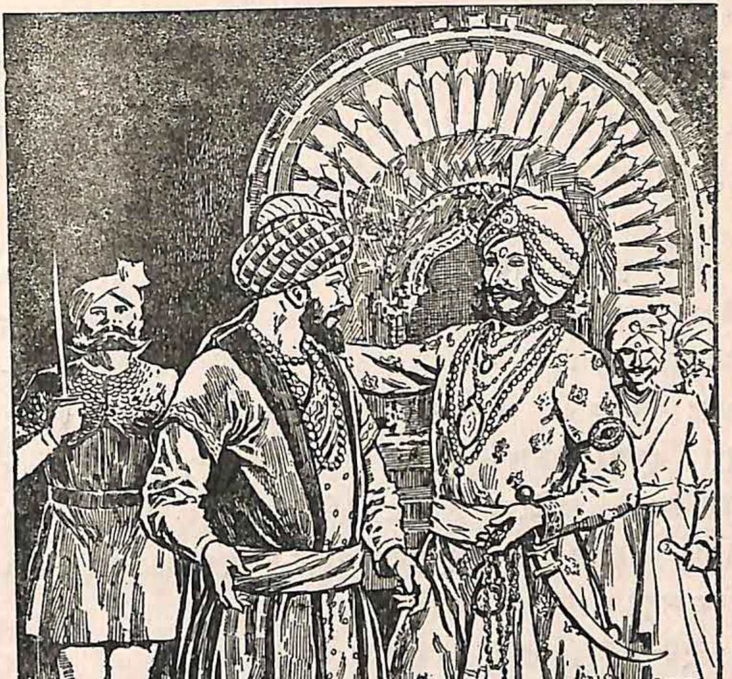
হইলও তাই। দস্যুতা করিতে আসিয়া মহম্মদ চিতোর-রাণার মহত্বের বেদীমূলে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া যেন একেবারে নিঃস্ব হইয়া ফিরিলেন। কোথায় গেল সেই শত্রুতা! আর কোথায় গেল জয়ের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা!

মালবে প্রত্যাবর্তনের পথে মহম্মদ সারা পথ শুধু রাজপুত জাতির কথাই ভাবিতে লাগিলেন! কি আশ্চর্য ধাতুতে গড়া এই মহাজাতি! এমন বজ্রের মত কঠোর, আবার এমন কুসুমের মত কোমল! এমন নির্ভীক বীরহৃদয়, আবার এমন স্নেহ-মমতায় ভরা! যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শত্রুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, আবার সে বন্দীর শৃঙ্খল এমন ভাবে সসম্মানে খুলিয়া দেয়!

মহম্মদ এই আশ্চর্য জাতির কথা ভাবিতে ভাবিতে মালবে ফিরিলেন। কিন্তু যে-মহম্মদ চিতোর-জয়ের স্পর্ধা লইয়া যুদ্ধে গিয়াছিলেন, এ মহম্মদ আর সে মহম্মদ ছিলেন না! রাজপুত রাণা যেন জাদুস্পর্শে তাহার আমূল পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন!

পরবর্তী জীবনে মহম্মদ এক ইতিবৃত্ত-গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রাণা কুম্ভের কথা আলোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"একটা হিংস্র পশু লোকালয়ে গিয়াছিল মানুষের রক্তের আস্বাদ গ্রহণ করিতে, কিন্তু মায়াবী মানুষের স্নেহ-মমতায় সে পশু হিংসা ভুলিয়া মানুষের বশ হইয়া গেল! একটা পাষণ্ড



তাহাদের স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিবেন না ।—এই আপনার মুক্তির পণ,

দস্যু যে-মানুষের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল, তাহারই এক বিন্দু দয়া পাইয়া সে দস্যু হইল তাহারই ভালবাসার কাঙাল! এমনই অসাধারণ মানুষ ছিলেন রাণা কুম্ভ।"

রাণা কুম্ভ যে কিরূপ উন্নত-স্বভাব, বীর-হৃদয় ও মহদন্তঃকরণ ছিলেন, পরাজিত শত্রুর এই উচ্ছ্বসিত অকুণ্ঠ প্রশংসাই তাহার চমৎকার পরিচয়। বাস্তবিক, রাজপুত জাতি যে সকল মহৎ-গুণের অধিকারী বলিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে, রাণা কুম্ভের জীবন-মুকুরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের বীর্যের সহিত ব্রাহ্মণের ক্ষমার সমন্বয়ে, নির্ভীক বীরত্বের সহিত কুসুমের স্বভাব-সুষমার সমাবেশে, কুম্ভের চরিত্র অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত হইয়াছিল!

কুম্ভ-নির্মিত একটি বিজয়স্তম্ভে রাণার জীবনের এই সুমধুর আলেখ্যটি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। মালব এবং গুর্জরের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ের চিহ্ন স্বরূপ রাণা কুম্ভ চিতোরে জয়স্তম্ভটি নির্মাণ করেন। স্তম্ভটি উচ্চতায় একশত কুড়ি ফুট ও নবতল বিশিষ্ট। স্তম্ভের নবম তলে শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডল উৎকীর্ণ। স্তম্ভগাত্রে বিভিন্ন শ্লোকে রাণা কুম্ভের শৌর্য কীর্তিত হইয়াছে।

একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে পৃথিবী কাঁপাইয়া সাগরের মতন বিশাল সৈন্যবাহিনী সঙ্গে লইয়া গুর্জরখণ্ড ও মালবের সুলতানগণ মেবার আক্রমণ করিয়াছিল। এই শত্রুসৈন্যের মধ্যে ব্যাঘ্রের মত অথবা শুষ্ক অরণ্যে অগ্নিশিখার মত বিরাজ করিতেছিলেন।

অপর একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, সূর্য যতদিন পৃথিবীকে

তাপিত করিবে, ততদিন রাণা কুম্ভের খ্যাতিও অম্লান থাকিবে। যতদিন উত্তরে হিমগিরি অটল থাকিবে, সমুদ্র পৃথিবীকে হারের মত বেষ্টন করিয়া থাকিবে, ততদিন কুম্ভের গৌরবও স্থায়ী হোক। তাঁহার রাজত্বের বিচিত্র ইতিহাস, তাঁহার রাজ্যের বর্ণচ্ছটা চিরকাল অটুট থাকুক। উদিত সূর্যরশ্মির মত সমুজ্জ্বল স্তম্ভের তোরণটি ভূমিপতির মত দণ্ডায়মান।

যুদ্ধজয়ের একাদশ বৎসর পর রাণা এই স্তম্ভটির নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। দশ বৎসরে ইহা সমাপ্ত হয়।

চিতোরে কুম্ভের এই জয়স্তম্ভ আজিও দর্শকদের মনে বিস্ময় জাগায়!

চার

রাণা কুম্ভ যে কেবল বীর যোদ্ধা ও ন্যায়পরায়ণ রাজাই ছিলেন তাহা নহে, স্থাপত্য-শিল্পের প্রতিও তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। তাঁহার সৌন্দর্যপ্রিয়তাও ছিল অসাধারণ! চিতোরে অদ্যাবধি রাণা কুম্ভের বহু চারুস্থাপত্য তাঁহার এই সৌন্দর্যানুরাগের পরিচয় বহন করিয়া আসিতেছে।

নাগোর রাজ্য বিজয় করিয়া কুম্ভ তথা হইতে বিশাল এক হনুমান মূর্তি আনয়ন করিয়া চিতোর-দুর্গের দ্বারদেশে স্থাপন করেন। মূর্তির নাম অনুসারে সেই দ্বার 'হনুমান দ্বার' নামে প্রসিদ্ধ।

আবুগিরির সানুদেশেও একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। রাণা

কুম্ভ স্বীয় বাহুবলে তাহাও অধিকার করিয়া লন এবং তথায় নূতন অস্ত্রাগার নির্মাণ করেন। অধিকাংশ সময়ই রাণা সেই দুর্গেই অতিবাহিত করিতেন। দুর্গমধ্যে অনেকগুলি মন্দির আছে, তাহার একটি মন্দিরে রাণা কুম্ভ ও তাঁহার পিতার পাষাণমূর্তি স্থাপিত আছে। আজও রাজপুতগণ সেই দুর্গে গিয়া এই দুই মহাবীরের চরণ-তলে তাঁহাদের পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিয়া থাকেন!

আবুগিরির শিরোদেশে রাণার আর এক সুবিশাল কীর্তিস্তম্ভ বিরাজিত আছে, তাহার নাল 'কুম্ভশ্যাম'। ইহার অপরূপ নির্মাণ-কৌশল ও কারুসৌন্দর্য দেখিলে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়। সে সময়েও আমাদের দেশে চারুস্থাপত্য কি পরিমাণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এ দেশের শিল্পীদের যন্ত্র যে তখন পাথর খোদিয়া কি অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারিত, কুম্ভশ্যাম তাহারই অপূর্ব নিদর্শন।

আবু-পর্বতের নিকট রাণা কুম্ভ 'বাসন্তী' নামে আরও একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। আরাবল্লীর নিকটেও রাণা 'মাচিন' নামে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন। ইহা ছাড়া, সত্রি-পর্বতের মধ্যপথে তিনি একটি সুবৃহৎ জৈন-মন্দিরও নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরটি ত্রিতল, অনেকগুলি প্রস্তর-স্তম্ভ সেই মন্দির-গাত্রে সুশোভিত। ইহাদের উচ্চতা প্রায় সাতাশ হাত। অপূর্ব কারুকার্য-খচিত এই মন্দির নির্মাণে দশ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল। রাণা ঋষভ-দেবের নামে এই পবিত্র মন্দিরটি উৎসর্গ করেন।

মেবার রাজ্যে তখন সর্বশুদ্ধ ৮৪টি দুর্গ ছিল, তন্মধ্যে রাণা কুম্ভ একাই ৩২টি নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৮৪টি দুর্গের মধ্যে 'কুম্ভমেরুই সর্বপ্রধান। এরূপ দুর্ভেদ্য গিরিপথে ইহা স্থাপিত, এবং এরূপ সুকৌশলে ইহা নির্মিত যে, সেই কূটপথ লঙ্ঘন করিয়া সেই দুর্গে প্রবেশ করা শত্রুর পক্ষে নিতান্তই দুঃসাধ্য ছিল।

রাণা কুম্ভ যে কেবল রণকুশল বা স্থাপত্যানুরাগী ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার কবিত্বশক্তি এবং সংগীতানুরাগও ছিল অসাধারণ। তাঁহার রচিত গীতগোবিন্দের পরিশিষ্ট রচনা-লালিত্যে ও কবিত্ব-রসে ভরপূর। এই কবি-রাজার সহিত বিবাহ হইয়াছিল মীরাবাঈ-এর। এ যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ! মীরাবাঈ নিজেও খুব বড় কবি ছিলেন, সংগীতেও তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল।

মীরার সুমধুর কণ্ঠে তাঁহার স্ব-রচিত দোঁহা শুনিয়া মুগ্ধ হয় নাই সে সময় সমগ্র মেবার খুঁজিলে এমন একটি লোকও পাওয়া যাইত না। মানুষ ত' মানুষ, মীরার ভজন-গান শুনিলে বনের পশুপক্ষীও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বশ মানিত।

মীরা গাহিতেন, কিন্তু সে গান কোন মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য নহে। গান ছিল মীরার ভগবৎ-আরাধনা—গানের মধ্য দিয়াই মীরা তাঁহার রণছোড়লাল গিরিধারীলালের উপাসনা করিতেন। তাই তাঁহার সংগীত এত মধুর হইত, এমন প্রাণের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

মেবারের এবং রাজস্থানের রণছোড়লাল—গিরিধারীলাল বা কৃষ্ণ উপাসনা সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার।

মেবারের রাণারা একলিঙ্গজী বা শিবের দেওয়ান ছিলেন।

রাজস্থানবাসীদের মধ্যেও শিব-উপাসনা বহুল প্রচলিত। ইহারই মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূজাও মেবার ও সমগ্র রাজস্থানে ব্যাপক হইয়া উঠে। শিব উপাসকদের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের সাধনা কিন্তু আদৌ কঠোর নয়। কৃষ্ণের উপাসক বা বৈষ্ণবদের মধ্যে দেবতা ও মানুষ একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তরা কৃষ্ণকে ঘরের শিশু সন্তান জ্ঞানে লালাজী গোপালজী ইত্যাদি সম্বোধনে আদর করেন। কৃষ্ণলীলার মানবিক আবেদন খুব বেশি। রাজস্থানের রমণীদের স্বামীর মৃত্যুর পর জহরব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইত। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর স্বর্গে স্বামীর সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহারা অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিয়া নিজেদের আহুতি দিতেন। এই প্রথার মধ্যে যে কাঠিন্য ও নিপীড়ন ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। শিব উপাসিকাগণ স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জহরব্রত অনুষ্ঠান করিতেন বাধ্য হইতেন। কিন্তু কৃষ্ণ সাধিকারা জহরব্রত অনুষ্ঠান না করিলেও সমাজে হেয় হইতেন না। বৈষ্ণব মানবিকতার মধ্যে জহর ব্রতের বিশেষ কিছু উচ্চস্থান ছিল না। বৈষ্ণব ধর্মের এই উদার ও মানবিক ভাবের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের পূজা মেবার ও রাজস্থানে জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

রাজস্থানের রাজা ও সর্দারগণ কৃষ্ণের মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বহু আখ্যানও প্রচলিত আছে। বীরখৈরা গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় যে, জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান পিতৃমাতৃহীন হইয়া জীবিকার জন্য একজন কলুর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কলু তাহাকে ঘানি টানিবার কাজে নিযুক্ত করে। নবনিযুক্ত ব্যক্তিটি কেমন কাজ জানে

দেখিবার জন্য কলু ঘানির কাছে আসে। তখন সে সবিস্ময়ে দেখে যে ঘানির নিকট রক্ষিত পাত্রে সরিষা হইতে তেলের পরিবর্তে রক্ত পড়িতেছে। দৃশ্যটি দেখিয়া কলু অত্যন্ত ভীত হয়। সে লোকটির প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।

কলুর প্রশ্নের উত্তরে নির্দোষ মানুষটি জানায়—আমি অসহায় অনাথ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সন্তান।

পরিচয় শুনিয়া কলু চমকাইয়া উঠে! ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সন্তানকে ঘানির কাজে নিয়োগ করা মহাপাপ। না জানিয়া কলু এই মহাপাপ করিয়াছে।

পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য কলু একবস্ত্রে দ্বারকার উদ্দেশে গৃহত্যাগ করে। তাহার দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ। তাহাতে মাটি রাখিয়া তুলসী বীজ রাখা হইয়াছে।

দীর্ঘ পদযাত্রার শেষে কলু বীরখৈরা গ্রাম হইতে দ্বারকায় আসিল।

দ্বারকা মন্দিরের পুরোহিতগণ কলুর আগমনের কারণ শুনিয়া তাহাকে সাগরে স্নান করিয়া দ্বারকানাথের নিকট তাহার প্রার্থনা নিবেদন করিতে বলিল।

কলু তাহাই করিল। সাগর স্নানের শেষে দ্বারকানাথ কলুর ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দর্শন দিলেন।

কলু ঘানির কাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সন্তান নিয়োগ করিয়া অজানিতে যে পাপ করিয়াছে তাহা হইতে কি ভাবে উদ্ধার পাইবে সেই কথাই দ্বারকানাথের নিকট জানিতে চাহিল।

দ্বারকানাথ কলুর হাতে একটি লিখিত আদেশপত্র দিলেন।

আদেশপত্রটি রাণাকে লেখা। আদেশপত্রে রাণাকে পঁয়তাল্লিশ বিঘা ভূমিদানের কথা লেখা ছিল।

দ্বারকনাথের আদেশপত্র সঙ্গে লইয়া কলু দ্বারকা হইতে স্বগ্রাম বীরখৈরায় ফিরিয়া আসিল।

সেখানে আসিয়া কলু জানিতে পারে যে, রাণা তখন পুরীতীর্থে অবস্থান করিতেছেন।

কলু সেই মুহূর্তেই পুরী যাত্রা করিল।

পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারে রাণার সহিত কলুর সাক্ষাৎ হইল।

কলু সমস্ত বৃত্তান্ত রাণাকে বলিয়া রাণার হস্তে দ্বারকানাথের আদেশপত্র দিল।

রাণা তাহা মাথায় তুলিয়া লইলেন। আদেশপত্র অনুসারে তিনি অনাথ পুরোহিত সন্তানকে পঁয়তাল্লিশ বিঘা জমি দান করিলেন।

অনাথ পুরোহিতের বংশধরগণ আজিও সেই জমি ভোগ করিতেছে।

দ্বারকানাথ মথুরানাথ গোকুলনাথ যদুনাথ বিঠলনাথ মধুসূদন নন্দন গিরিধারীলাল লালজী ইত্যাদি নানা নামেই কৃষ্ণ রাজস্থানে পূজিত হন। মীরা তাঁহার দেবতাকে গিরিধারীলাল রণছোড়জী বলিয়া ডাকিতেন।

ফাল্গুন মাস শ্রীকৃষ্ণের দোল-উৎসবের মাস। সারা ফাল্গুন মাস জুড়িয়া রাজোয়ারার মানুষ দোল উৎসবে মাতিয়া থাকে।

'আহেরিয়া' উৎসব দ্বারা ফাল্গুন মাস শুরু হয়। 'আহেরিয়া'-কে বলা হয় মহরত্ কা শিকার অর্থাৎ শিকারের মহরত।

বাস্তবিক পক্ষে 'আহেরিয়া' শিকারেরই উৎসব। শিকার যাত্রার পূর্ব দিন মেবারের রাণা সর্দার ও কর্মচারীদের মধ্যে সবুজ রঙের পোশাক বা কাপড় বিতরণ করেন। সর্দারগণ এবং শিকারে যোগদানকারী ব্যক্তিগণ তাহাদের সর্বাধিক সুন্দর ঘোড়া সজ্জিত করিয়া উপস্থিত থাকে। শূকর শিকারই প্রধান লক্ষ্য। কারণ শূকর শিকারকে রাজপুতগণ শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করে। মহরতের দিন শিকার না পাওয়া অশুভ লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। তাই এমনভাবে শিকার-যাত্রা পরিকল্পিত হয় যে, শূকর-শিকার যেন সুনিশ্চিত হয়। অশ্বপৃষ্ঠে 'খণ্ড' অর্থাৎ তরবারি এবং 'বিরচি' বা বর্শা সঙ্গে লইয়া শিকারীরা বন ঘেরাও করে। তারপর আরম্ভ হয় শূকর সন্ধান ও শূকরের পশ্চাদ্ধাবন। শিকারের নেশায় রাজপুতগণ এমন-ভাবে মাতিয়া যায় যে, শিকারীদের হাত-পা ভাঙা বা একের বর্শা অপরের দেহে বিঁধিয়া যাওয়া 'আহেরিয়া'র দিন বিরল ঘটনা নয়।

এই সময়ে মেবার রাজপ্রাসাদের রন্ধনশালা 'আহেরিয়া'র নায়ক রাণার সঙ্গে সঙ্গে শিকার স্থানের সন্নিহিত খোলা মাঠে চলিয়া আসে। শূকর, বিশেষত শূকর ছানার মাংস রাজপুতদের প্রিয় খাদ্য। শিকারে প্রাপ্ত শূকর মাংস মাঠের রন্ধনশালায় পাক করিয়া রাণা ও তাঁহার সঙ্গী শিকারীরা একত্রে পান-ভোজন করে।

দেবী গৌরীকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার বরলাভের জন্যই 'আহেরিয়া' অনুষ্ঠিত হয়। 'আহেরিয়া' ধর্মের আবরণে রাজপুতদের সামরিক উৎসব।

'আহেরিয়ার' পর ফাগ। ফাল্গুনের শ্রেষ্ঠ উৎসব। ফাগ উৎসব বা হোলির সময় রাজপুত বালক-বালিকা পুরুষ নারীর দল পথে

বাহির হইয়া আসে। আবির কুমকুম রঙে পিচকারিতে মানুষজন পথঘাট রঙিন হইয়া যায়। হোলির দিনে ছোট-বড় সামাজিক সব বাধাই ভাঙিয়া যায়। এমন কি, সেদিন মেবারের সর্দারগণ মেবারের রাণাকে লইয়াও রঙ্গ-রসিকতা করে।

শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব, হোলি বা ফাগের সর্বাধিক বর্ণাঢ্য উৎসব হয় মেবার প্রাসাদে। তখন মেবারের রাণা রাণীদের সঙ্গে হোলি খেলেন। প্রাসাদে কর্মরত নারী-পুরুষদের সঙ্গেও তিনি হোলিতে যোগ দেন। প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সর্দারগণ অশ্বপৃষ্ঠে হোলি খেলিতে নামেন। তখন হোলির উত্তেজনার চরম মুহূর্ত। প্রাসাদ হইতে সর্দারদের রঙ আবির পিচকারি সরবরাহ করা হয়।

রাত্রে উৎসবের শেষে রাণা সর্দারদের সঙ্গে প্রাসাদের একটি কক্ষে মিলিত হন। তখন চারণগণ গান করে। কাব্যপাঠ হয়। সকলের সঙ্গে সকলের রঙ্গ-রসিকতাও চলে। রাণা সর্দারদের খঙ্গ বা তরবারি এবং নারিকেল উপহার দেন।

চল্লিশ দিন ধরিয়া হোলি উৎসব চলে। চল্লিশ দিনের দিন সন্ধ্যায় বিশাল অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলন করা হয়। সেই কুণ্ড ঘিরিয়া ঘিরিয়া বালক-বালিকাগণ নৃত্যগীত করে। তারপর চৈত্রের দাবদাহে রাজস্থান জ্বলিতে থাকে।

অতএব কৃষ্ণ উপাসনা মেবার ও রাজস্থানে দীর্ঘকাল হইতেই প্রচলিত। কুম্ভ ও মীরাবাঈ উভয়েই কৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন। তবে মীরার পূজা ছিল শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ। কুম্ভকে হয়ত উৎসব ও হোলির জাঁকজমকই বেশি আকর্ষণ করিয়াছিল।

সমগ্র রাজস্থানে তখন রাণা কুম্ভ যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ

ছিলেন রাজপুত নারীদিগের মধ্যে মীরাবাঈও তেমনই অনন্য-সাধারণ। যোগ্যের সহিতই যোগ্যার মিলন হইয়াছিল। কিন্তু তবু তাঁহাদের মিলন তেমন সুখের হয় নাই, বিবাহের কিছুকাল পরেই তাঁহাদের জীবনাকাশে বিচ্ছেদের মেঘ ঘনাইয়া আসিল।

বাল্যকাল হইতেই মীরা ছিলেন অসীম ধর্ম-পরায়ণা। তাঁহাদের গৃহদেবতা গিরিধারীলাল ছিলেন মীরার হৃদয়সিংহাসনের একমাত্র অধিকারী। মীরা তাঁহার নির্মল অন্তরের উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বালিয়া নিশিদিন তাঁহার উপাস্য দেবতার মুখের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিতেন। সে ভুবনমোহন মুখের দিকে চাহিয়া মীরার আর আশা মিটিত না!

সমবয়সী মেয়েরা তাঁহাকে লইয়া কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত! মীরার মাও তাঁহার এই একান্ত তন্ময়তাকে 'পাগলামি' মনে করিয়া এই 'পাগলী' মেয়েকে একটু অসাধারণ স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন।

মীরা গিরিধারীলালের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেন। আপন মনে তাঁহার আত্মার আত্মীয়কে ভজন গান শুনাইতেন। গিরিধারীলালের পক্ষ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া কাঁদিয়া ভাসাইতেন, অভিমানের অনুযোগ-বাণী শুনাইতেন। আবার পরক্ষণেই অনুতাপে গলিয়া গিয়া গিরিধারীর নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিতেন।

এমন করিয়াই শিশু মীরা কৈশোরে পদার্পণ করিলেন। অবশেষে কৈশোরও অতিক্রান্ত হইল। কিশোরী মীরার দেহে যৌবন-সুষমা ফুটিয়া উঠিল।

মীরার পিতামাতা তখন কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া

উঠিলেন। এ ব্যস্ততার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না; কেননা মীরার রূপগুণের খ্যাতি ও তাঁহার ভগবদ্ভক্তি তখন প্রবাদ-বাক্যের মত সমগ্র রাজস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

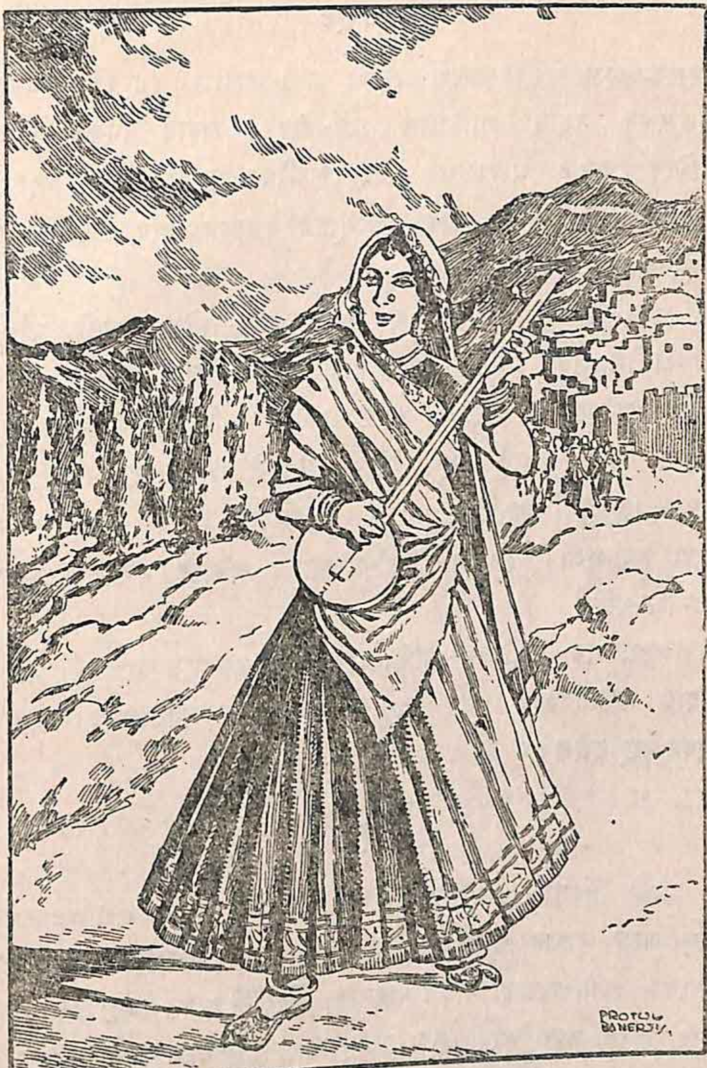
সে সুখ্যাতির সৌরভ চিতোরের রাজপ্রাসাদে রাণা কুম্ভের নিকটও পৌঁছিল। রাণা কুম্ভ মীরার পাণিগ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন।

সমগ্র মেবারে তখন রাণা কুম্ভের মতো দ্বিতীয় পুরুষ আর কেহ ছিলেন না। তাই শুভদিনে মীরার পিতা সানন্দে কন্যাকে কুম্ভের হাতে সমর্পণ করিলেন। পিতৃগৃহ ছাড়িয়া—গিরিধারী-লালকে ছাড়িয়া মীরা স্বামী-গৃহে চলিলেন। কিন্তু তখনও গিরিধারীলালই মীরার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া রহিলেন।

রাণা কুম্ভ মীরাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসিতেন, মীরাও স্বামীপ্রেমের প্রতিদান দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পারিতেন না। শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে—গিরিধারী-লালই মীরার হৃদয়-সর্বস্ব হইয়া রহিলেন।

স্বামী-গৃহে আসিয়াও মীরার সেই একই চিন্তা—গিরিধারী-লাল! একাকী বসিয়া তিনি গিরিধারীলালের উদ্দেশ্যে অশ্রুর তর্পণ করিতেন, গানের অর্ঘ্যে তাঁহার অন্তরতমের নিকট আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিতেন।

মীরার আনন্দিত কণ্ঠে সুমধুর সংগীত শ্রবণের আশায় রাজ-অন্তঃপুরে ভিড় জমিয়া যাইত। রাণার এতটা ভাল লাগিত না! তিনি চাহিতেন মীরাকে একা। কিন্তু মীরা যে বহু পূর্বেই আপনাকে নিঃশেষে সমস্ত জগতে ছড়াইয়া দিয়াছেন! আর কি



হাতের একতারাটিতে ভক্তির একটিমাত্র স্থর ঝংকৃত করিয়া, কণ্ঠে মধু ঢালিয়া মীরা চলিলেন তাঁহার নন্দলালার উদ্দেশ। [পৃঃ— ২৬

তাঁহাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখা চলে? যে বিহঙ্গ অনন্ত আকাশের সন্ধান পাইয়াছে, স্বর্ণ-পিঞ্জর তাহার নিকট ভাল লাগিবে কেন? মীরা যে তাঁহার জীবন-দেবতার দেখা পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, রাণার রাজ-অন্তঃপুরের বন্ধনের মধ্যে তিনি ধরা পড়িবেন কেন?

শেষে একদিন রাণার আদেশে মীরা—চিতোরেশ্বরী মীরা, গিরিধারীলালের মীরা—সামান্য ভিখারিণী-বেশে অজ্ঞাত পথে বাহির হইলেন। হাতের একতারাটিতে ভক্তির একটিমাত্র সুর ঝংকৃত করিয়া, কণ্ঠে মধু ঢালিয়া মীরা চলিলেন তাঁহার নন্দলালার উদ্দেশে। মীরা গাহিতে গাহিতে চলিলেন, 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!' সে গান শুনিয়া পথের দু'ধারে সকলের চক্ষুতে প্রেমাশ্রু বহিল।

নন্দলালার মীরা—গিরিধারীলাল রণছোড়লালের মীরা, তাঁহার ইষ্টদেবতার পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিলেন! মীরার জীবন ধন্য হইল।

পাঁচ

মীরা ছিলেন মেবারের রাজলক্ষ্মী। তাঁহার মেবার পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রাণার নানা দুর্বুদ্ধি দেখা দিল। ঝালোয়ারের রাঠোর সর্দারের এক কন্যার সহিত মারবার-পতির বিবাহের সমস্ত আয়োজন স্থির, এমন সময় রাণা কুম্ভ বলপূর্বক ঝালোয়ার কুমারীকে হরণ করিয়া কুম্ভমেরু দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। বন্দী হইয়াও সর্দার-কন্যা মারবার-রাজকে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি আপন

কক্ষে ম্লান দীপালোকে বসিয়া মারবার-রাজের কথাই ধ্যান করিতেন।

কুম্ভমেরুর প্রাসাদশ্রেণী মুন্দর দুর্গ হইতে অস্পষ্ট দেখা যাইত। মারবার-অধিপতি তথা হইতে কুম্ভমেরুর কক্ষস্থিত দীপশিখাটিকে ঝালোয়ার-কুমারীর প্রেম-সংকেত কল্পনা করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। সর্দার-কন্যা আশাভঙ্গের মনস্তাপে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এমন করিয়া রাণার নিষ্ঠুরতার তপ্ত নিশ্বাসে একটি অম্লান কুসুম অকালে ঝরিয়া পড়িল।

ইহার পর রাণা আর এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রায়মল্লকে ইদর রাজ্যে নির্বাসিত করিলেন।

রাণা কুম্ভ যেদিন ঝুন্‌ঝুন্‌-নরপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, তাহার পর হইতেই কোন আসনে বসিবার পূর্বে তাঁহার তরবারি তিনবার মাথার চারদিকে ঘুরাইতেন। ক্রমে ইহা তাঁহার মুদ্রাদোষে পরিণত হইল। রায়মল্ল প্রতিদিনই পিতার এই অদ্ভুত কাজটি দেখিতেন, কিন্তু কোন দিনই ইহার কোন অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। অবশেষে কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া পিতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেন মহা অপরাধের কাজ! কুম্ভ এই প্রশ্নে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রায়মল্লের উপর নির্বাসন দণ্ডের আদেশ হইল। রাজপুত সন্তানদের নিকট পিতার আদেশ দেবতার আদেশের মতো; তাই রায়মল্ল পিতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া চিতোর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

কুম্ভ কি কারণে চারণদিগের উপরও ভয়ানক বিরক্ত হইয়াছিলেন! রাজানুগ্রহেই মুখ্যতঃ ইহাদের জীবিকা-নির্বাহ হইত। গৌরবময় অতীতের ও রাজস্থানের মৃত বীরপুরুষদের জয়গান গাহিয়া গাহিয়া ইহারা দুর্বলকে দিত শক্তির প্রেরণা, শোকার্তকে দিত সান্ত্বনার প্রলেপ আর কাপুরুষদের প্রাণে জ্বালিয়া তুলিত শক্তির হোমানল। ইহার বিনিময়ে দেশের রাজা যোগাইতেন ইহাদের জীবিকা।

রাণা যখন তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, তখন তাহাদের ভয়ানক দুরবস্থা উপস্থিত হইল। অথচ রাণার বিরুদ্ধে কিছু করিবারও উপায় নাই। অবশেষে তাহাদের মধ্যে একজন কৌশলে রাণার প্রাণসংহার করিয়া ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিল।

শীঘ্রই একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। রাণা হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে এই চারণ ব্রাহ্মণই রাণার কররেখা গণনা করিয়া বলিল যে, এ রোগ হইতে তাঁহার আর নিস্তার নাই।

ব্রাহ্মণের কথায় বিশ্বাস করিয়া রাণা জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার হাতেই আপন চিকিৎসার ভার অর্পণ করিলেন। এই কুচক্রী ব্রাহ্মণই রাণার রোগ পরীক্ষা করিত, স্বীয় ব্যবস্থামতো ঔষধ সংগ্রহ করিয়া রাণাকে খাইতে দিত।

কিন্তু এই চারণ ব্রাহ্মণের ভণ্ডামি শীঘ্রই ধরা পড়িল। সে সপ্তধাতু-মিশ্রিত বিষাক্ত ঔষধ রাণাকে খাইতে দিত। অবশেষে একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকের হস্তে রাণার চিকিৎসার ভার পড়িল। তিনি তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া তুলিলেন।



দুরাচার উদা তাহার পিতার বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। [পৃঃ—৩১

ব্রাহ্মণ অবধ্য বলিয়া রাণা কুচক্রী চারণের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা না করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া দিলেন।

কুচক্রী ব্রাহ্মণ ও জ্যোতিষী কর্তৃক রাজহত্যা রাজপুত রাজ-পরিবারে বিরল ঘটনা নহে। উনবিংশ শতাব্দীতেও রাজস্থানে এইরূপ ঘটনার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। সে সময় জেমস টড পশ্চিম রাজপুত রাজ্যগুলির পলিটিক্যাল এজেণ্ট ছিলেন। উদয়পুরের রাণার সহিত তাঁহার খুব বন্ধুত্ব ছিল।

প্রতি বর্ষাতেই উদয়পুরের রাণা রোগে ভুগিতেন। একজন ব্রাহ্মণ রাণার জ্যেষ্ঠ ভগিনীর বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করিতেন। এই ব্রাহ্মণই আবার রাণার জ্যোতিষী ও চিকিৎসক ছিলেন। ব্রাহ্মণ রাণার কোষ্ঠী বিচার করিয়া জানান যে, বৎসরটি রাণার পক্ষে অত্যন্ত দুঃবৎসর। রাণার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চিকিৎসক-জ্যোতিষী সপ্তধাতু-মিশ্রিত ঔষধের ব্যবস্থা করেন—ঠিক যেমন রাণা কুম্ভের জন্যও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রেই এই ঔষধ ছিল বিষ। সপ্তধাতু-মিশ্রিত বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রাণাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেওয়াই ছিল কুচক্রী ব্রাহ্মণদের মূল উদ্দেশ্য।

জেমস টড রাণার জ্যোতিষী-চিকিৎসকের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া উদয়পুরের রাণাকে সপ্তধাতু-মিশ্রিত ঔষধ গ্রহণ হইতে বিরত করেন। তিনি ব্রাহ্মণের পরিবর্তে ডঃ ডানকানকে রাণার চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করেন। ডঃ ডানকানের চিকিৎসার ফলে উদয়পুরের রাণা দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন।

সুস্থ হইয়া রাণা কুচক্রী ব্রাহ্মণকে ষড়যন্ত্র-দ্বারা-লব্ধ বিষয়-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করেন। কিন্তু কুম্ভের মতন তিনিও ব্রাহ্মণকে চরম দণ্ড দেন নাই।

যুগ যুগ ধরিয়া রাজপুত ধারা একই ভাবে বহিয়া চলিয়াছে।

ছয়

চক্রীর চক্রান্ত হইতে রাণার প্রাণ রক্ষা হইল বটে, কিন্তু আর বেশী দিন তিনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন না। অতি শোচনীয়ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইল।

উদা নামে রাণার এক দুরাচার পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রায়মল্লের নির্বাসনের সুযোগ লইয়া সে একদিন তাহার পিতার বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। মহারাণা কুম্ভ—চিতোর-গৌরব কুম্ভ—কবি, প্রেমিক, সংগীত-প্রিয় ও শিল্পানুরাগী কুম্ভের জীবন-প্রদীপ এই ভাবে নির্বাপিত হইল।

পাষণ্ড উদা পিতার জীবন নাশ করিয়া ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিল। সেই নির্বাসিত চারণ ব্রাহ্মণ উদার মনে রাজ্যলাভের এই দুরাশা জাগাইয়া দিয়াছিল; গোপনে গোপনে সে-ই উদাকে এ জঘন্য কর্মে প্ররোচিত করিয়াছিল। তাই উদা রাজ-সিংহাসনে বসিয়াই সেই নরাধম চারণকে মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিল।

যেমন রাণা, তেমনই মন্ত্রী! ইহার ফলে দুইদিনেই চিতোরে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। মাত্র পাঁচ বৎসর উদা রাজ্য-শাসন করে, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই চিতোরের পূর্ব-শ্রী ও গৌরব বহুলাংশে বিনষ্ট হইয়া গেল।

এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড মেবারবাসীর মনে উদার প্রতি এত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল যে, পিতৃহত্যার পর মেবারের মানুষ কখনও উদাকে স্বনামে উল্লেখ করে নাই। উদা সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে 'হাতিয়ারো' 'ঘাতীরাও' (অর্থাৎ ঘাতক) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হইত।

উদার এই লোমহর্ষণ কুকাণ্ড ইদরে রায়মল্লের কানে গিয়াও পৌঁছিল। চিতোরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিতোর আক্রমণ

করিয়া চিতোরের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। চিতোরবাসী সকলেই রায়মল্লকে শ্রদ্ধা করিত, তাই তাহারা সানন্দে তাঁহাকে রাণা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল।

উপায়ান্তর না দেখিয়া উদা—রাজস্থানের কলঙ্ক, চিতোর-রাজবংশের কলঙ্ক, পাষণ্ড উদা—দিল্লী-সম্রাটের পদ-লেহন করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবার জন্য দিল্লী ছুটিল। দিল্লীশ্বরের সাহায্যের বিনিময়ে রাজপুত-কুলাঙ্গার উদা বাপ্পার পবিত্র কুলে কালিমা লেপন করিয়া স্বীয় তনয়াকে দিল্লী-সম্রাটের করে সমর্পণ করিতে মনস্থ করিল।

কিন্তু রাজপুত-কুলে এভাবে কলঙ্ক-লেপন ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না, তাই দিল্লী হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পথে বজ্রাঘাতেই তাহার মৃত্যু হয়। তখন দিল্লীশ্বর উদার পুত্র শেষমল্ল ও সূর্যমল্লকে লইয়া সসৈন্যে মেবার আক্রমণ করিলেন। রাজস্থানের ধূসর পথে ধূলি উড়াইয়া মুসলমান সৈন্যবাহিনী মেবারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই সংবাদ পাইয়া রায়মল্লও আটান্ন হাজার অশ্বারোহী ও এগার হাজার পদাতিক লইয়া মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। নাথদ্বারের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল।

অবশেষে রাজপুতের তরবারির নিকট মুসলমান-বাহিনী বিপর্যস্ত হইয়া গেল। রক্তাক্ত-কলেবর মুসলমান সৈন্য প্রাণ-ভয়ে দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল।

'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' নাদে আবার মেবারের প্রান্তর কাঁপিয়া উঠিল। রাণা কুম্ভের মেবার স্বাধীনতা-গৌরবে পূর্বের মতোই হাসিতে লাগিল। রাণা রায়মল্ল মুসলমানদিগের আমক্রণ হইতে চিতোর রক্ষা করিয়া রাণা কুম্ভের গৌরব ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

ছোটদের রাজস্থান গ্রন্থমালা পরবর্তী গ্রন্থ **রাণা সঙ্গ**।

—ঃ রাজস্থান গ্রন্থমালা ঃ—

নবম গ্রন্থ

রাণা সঙ্গ